মুলপাতা

আঁধার-আলো

Anika Tuba

May 16, 2016

21 MIN READ

[১]

পেটের মধ্যে হঠাৎ একটা গুঁতো খেয়ে চমকে উঠলাম, কদিন ধরেই দেখছি পেটের মধ্যে লাগে কী যেন মোচড়ামুচড়ি করছে। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। বড়ো কোনো অসুখ হলো না তো! কিছু একটা হলেই আমার প্রথমে মরার চিন্তা মাথায় আসে। ছোটবেলা থেকেই আমি একটু ভীতু প্রকৃতির। একবার জ্বর হলো ছোটবেলায়, সাথে দুইবার হড়হড় করে বমি করলাম,

বমির সাথে রক্ত দেখে আমি ভয়ে শেষ! মনে মনে ভাবলাম ব্লাড ক্যান্সার, আমি বুঝি মারা যাচ্ছি। চোখ ঠেলে পানি বেরিয়ে এলো, যতোটা না অসুখের প্রকোপে, তারচেয়ে অনেক বেশি আশু মৃত্যুচিন্তায়। এই পৃথিবী থেকে এতো ছোট বয়সেই চলে যাবো? সে যাত্রা অবশ্য বেঁচে গেছিলাম...কিন্তু এবার কী হলো?

চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে বসে আছি, এদিকে মিতু ফোন দিলো। মিতু আমার সাথেই পড়ে, এক নম্বরের বদ মেয়ে। দুনিয়ার সব ছেলেকে এক হাতে কিনে আরেক হাতে বেঁচতে পারবে। ছেলে পটাতেও সেরা, ছেলে নাচাতেও সেরা। ওর সামনে দুনিয়ার সকল প্লেবয় শিশু। তবে প্রেমিকা হিসেবে যেমনই হোক, বন্ধু হিসেবে অসাধারণ। এমন কোনো বিপদ-আপদ নাই যখন ওকে পাশে পাওয়া যায় না। একটা ডাক দিলে দিন নাই, রাত নাই, হাজির হবে। বাসা থেকেও প্রচুর স্বাধীনতা পায়। ধনীর ঘরের আদরের দুলালি, আমাদের মতো এতো রেস্ট্রিকশন নাই, তাই বাপ-মায়ের সাথে অতো লুকোছাপা করতে হয় না।

- হ্যালো, হ্যাঁ বল।

- কীরে এতোক্ষণ লাগে ফোন ধরতে?

- একটু টেনশনে ছিলাম....

- ক্যান কী অইসে?

- মনে হয় বড়ো কোনো অসুখ। ফট কইরা মরে যাবো...

- ঢং করস? কী হইসে ঠিক করে বল

- পেটের মধ্যে কয়দিন ধরে কেমন জানি করতেসে,

- হাগু পাইসে ডারলিং? হি হি হি...

- আমি সিরিয়াস দোস্ত। একটু আগেই হঠাৎ মনে হইলো একটা শিং মাছ গুঁতা মারলো, এই যে এইমাত্র আবার!! খুবই টেনশনে আছি মিতু, অসুখ-টসুখ কী যে হইলো...

- ওহ নো! তুই এতো টেনশন করিস না, তোর প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা আছে তো? না করে থাকলে টেস্ট করে আমাকে একটা কল দে।

আমার বুকের মধ্যে ছ্যাৎ করে উঠলো! মিতুর মুখে কিচ্ছু আটকায় না। প্রেগনেন্সি টেস্ট ওর জন্য ছেলেখেলা। আমার তো কথাটা মাথাতেই আসে নাই।

আচ্ছা রাখি এখন, বলে কোনোমতে ফোনটা রেখেই দৌড়

দিলাম। ড্রয়ারের মধ্যে কাপড়-চোপড়ের তলে রাখা স্ট্রিপগুলো থেকে একটা স্ট্রিপ টেনে বের করে হাতে নিলাম। মাথা দপদপ করছে। সত্যিই যদি এমন কিছু হয়! কী করবো, কোথায় যাবো! সুমন! সুমনকে একটা ফোন দিতে হবে এক্ষুণি!

ফোনটা তুলে নিজের অজান্তেই আবার মিতুকেই লাগালাম।

- করেছিস?

- সাহস পাচ্ছি না। যদি সত্যি প্রেগন্যান্ট হই? আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম।

- তুই এখনও দাঁড়ায় আছিস স্টুপিড!! যা তুই, আগে হোক তারপর বাকি চিন্তা। আমি ফোন ধরেই আছি, তুই এক্ষুণি করে আয়।

- ওকে!

একটা দাগ একটু একটু করে ভেসে উঠছে। একটা মানে নেগেটিভ...মাথা কাজ করছে না। বাথরুমে বসেই মনে মনে আল্লাহকে ডাকছি! “হে আল্লাহ, নেগেটিভ দাও, নেগেটিভ দাও...” একটা রেখা এখন পুরোটা ভেসে উঠেছে। আরেকটা

রেখা না ভাসলেই হলো। “ওহ আল্লাহ! আমি ভালো হয়ে যাবো, নামাজ পড়বো পাঁচ ওয়াক্ত, আরেকটা দাগ যেন না উঠে... প্লীজ প্লীজ প্লীজ...” একি! আরেকটা দাগ.. আস্তে আস্তে দ্বিতীয় দাগটাও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। না, এ হতে পারে না। আমি আর সুমন সব সময় প্রোটেকশন ব্যবহার করেছি। তাহলে, কীভাবে!

[২]

ঠোঁট-মুখ শুকিয়ে গেছে। আরেকবার টেস্ট করতে হবে। এখনই নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। অন্য কোনো কারণে কি পজিটিভ রেজাল্ট দেখাতে পারে? দেরি করা যাবে না, কালই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

- হ্যালো, মিতু।

- বল

- আই থিঙ্ক আই অ্যাম প্রেগন্যান্ট। তুই কালই আমার সাথে ডাক্তারের কাছে যেতে পারবি?

- ওকে নো প্রবলেম! বাট ডোন্ট প্যানিক মাই লাভ, ওকে?

- ওকে

ফোনটা ছেড়ে সোফাতেই গা এলিয়ে দিলাম। খুব ক্লান্ত লাগছে। হাতটা অটমেটিক চলে গেলো পেটের ওপর। আমার পেটে সত্যিই কি সুমনের বাচ্চা? প্রথম বাচ্চা পেটে আসার অনুভূতিটা কেমন হওয়ার কথা? ভয়, আতঙ্ক, উদ্বেগ ছাড়া আমার মধ্যে আর কোনো অনুভূতিই কাজ করছে না।

মিতুর সাথে অদ্ভুত একটা হাসপাতালে গেলাম পরদিন। আমি জানি, ও এসব জায়গা ভালো চেনে। ওর অভিজ্ঞতা আছে। হাসপাতালে পরীক্ষা করেও একই রিপোর্ট পেলাম। ডাক্তার লোকটা দুলেদুলে হেসে বললো, ডোন্ট ওয়ারি, আমাদের সব ব্যবস্থা আছে। শুধু একটা স্ক্যান করে জেনে নিন প্রেগনেন্সি কতদিনের হলো তিন-চার মাসের হলে সহজেই ব্যবস্থা করা যাবে। খুবই পরিষ্কার ইঙ্গিত। অবশ্য আমি মোটামুটি মানসিক প্রস্তুতি আগে থেকেই নিয়ে এসেছি, বিয়ের আগে এই মুহূর্তে বাচ্চা পেটে আসলে অ্যাবরশন করাবো। এছাড়া আর কীই বা উপায়? সুমনের এখনও পড়াশোনাই শেষ হয় নি। বিয়ে করার মতো কোনো সামর্থ্য ওর এখনও নেই। আর আমার বাবা-মায়ের কাছেও সুমনের কথা তোলার প্রশ্নই আসে না! একটা বেকার সমবয়সী ছাত্রের কাছে মেয়ে বিয়ে দেবে –

এতোটা পাগল তারা এখনও হন নি। হাসপাতাল থেকে বের হয়েই প্রথমে সুমনকে ফোন দিলাম।

- দেখা করতে পারবে? খুবই আর্জেন্ট।

সুমন আধ ঘণ্টার মাঝেই চলে এলো। আমি ডাকলে সব ছেড়ে হলেও ও ঠিকই আসবে। আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে সুমন। ওর সাথে কথা না বলে একা একা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাই না আমি।

মিতু সাথেই ছিল। সুমনের কাছে ব্যাপারটা ও-ই খুলে বললো। দেখতে পেলাম সঙ্গে সঙ্গেই ওর মুখের রঙ বদলে গেলো। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিলো সুমন। আমি একপাশে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছি। সুমন ডেকে আমাকে কাছে নিলো। খুবই আদর করে বললো, চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার মুখ দিয়ে স্বগতোক্তির মতো একটা কথা বেরিয়ে এলো, “আমরা এখন কী করবো?”

- দেখো জান, বিয়ে করা এখন আমাদের জন্য ‘ওয়াইজ’ হবে না। তুমি তো জানো আমি এখনও স্টুডেন্ট, আর আংকেল-আন্টিও এখন তোমাকে বিয়ে দিবে না। তাছাড়া এখন বিয়ে করলে তোমার পড়াশোনা, ক্যারিয়ারের কী হবে! সো, আসো

আমরা অ্যাবরশন করে ফেলি। বিয়ে হলে আমরা দুইজন রেডি হয়ে আমাদের বেবি নিবো, কেমন?

আমি সুমনের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলাম। আমাদের বাচ্চা অ্যাবোর্ট করার কথা ভেবে হঠাৎ খুব খারাপ লাগতে শুরু করলো। যদিও বুঝতে পারছি এমন দুঃখ পাওয়ার কোনো কারণই নেই। সুমন একদম প্র্যাকটিকাল কথাটাই বলেছে। আমাদের পক্ষে এখন বিয়ে করাটা অসম্ভব ব্যাপার! আর এই সমাজে এমন বাচ্চা জন্ম দেওয়ার কথা ভাবাই যায় না...কেউ মেনে নেবে না।

আমি রাজি হলাম। মানুষের হাতে সব ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতা সবসময় থাকে না, একটা না একটা দিকে ছাড় দিতেই হয়।

[৩]

তিনদিন পরে স্ক্যান করার জন্য হাসপাতালে এসেছি। এবার সাথে সুমনও আছে। রিপোর্ট ঠিকঠাক থাকলে আজই অ্যাবোর্ট করে ফেলবো।

কিন্তু হাসপাতালে আমার জন্য এতো বড়ো চমক অপেক্ষা

করছিলো কে জানতো।

আমার রিপোর্টে দেখাচ্ছে আমি প্রায় ছ'মাসের গর্ভবতী! সুমনকে সাথে দেখে নার্স ধরেই নিয়েছে যে আমরা বিবাহিত। হেসে হেসে বললো, আপনি ছয় মাসের প্রেগন্যান্ট আর আপনি জানেনও না? খুব লাকি আপু আপনে, আমার বাচ্চা পেটে আসার সাথে সাথে এমুন বমি আরম্ভ হইছিলো...

আর কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না আমি। মাথাটা ভো-ভো করছে। মনে হচ্ছে পৃথিবীর সময় থেমে গিয়েছে।

সুমনের দিকে তাকালাম, দেখি ওর চোখেমুখেও থমথমে ভাব। ডাক্তারের চেম্বারে গেলাম আবারও। আজকে তাকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে। আমাদেরকে বুঝিয়ে বললো, প্রেগনেন্সি এন্ড করা এখন আর সম্ভব না, বেশি দেরি হয়ে গেছে। এখন অ্যাবোরশন করলে আমি মারাও যেতে পারি।

এরপর আর কোনো কথা চলে না, তবুও সুমন যতোভাবে পারলো ডাক্তারের কাছে অনুনয়-বিনয় করে অনুরোধ করতে লাগলো। খালি পা দুইটা ধরা বাকি ছিল। কিন্তু ডাক্তার কোনোভাবেই অ্যাবরশন করতে রাজি হলো না। এইসব ধরা পড়লে পুলিশ কেইস নিয়ে টানাটানি।

বাসায় ফিরে আমি পুরো ইন্টারনেট তন্ন-তন্ন করে ফেললাম। পড়ে যা বুঝলাম, এখন আর ওষুধ খেয়ে গর্ভপাতের সময় নেই। টাকাপয়সা দিয়ে যদি কোথাও সার্জারি করা ম্যানেজ করতেও পারি, তাহলে আমার মারা যাওয়ার সম্ভাবনাই সর্বোচ্চ। যদিও আত্মহত্যার কথা অনেকেই ভাবে, কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যু যখন এভাবে চোখের সামনে অপশন আকারে হাজির হয়, তখন সেটা সহজে বরণ করে নেওয়া যায় না। আমার সামনে বিশাল ভবিষ্যৎ পড়ে আছে! এতোদিন কষ্ট করে এই পর্যন্ত এসেছি, কতো স্বপ্ন, কতো প্রত্যাশা! বাচ্চা এখন নিবো না দেখে মারা যাবো - এই পরিণতিটা ঠিক মেনে নেওয়ার মতো না।

কিন্তু আশঙ্কা আর ভয়ে আমি অস্থির হয়ে আছি! মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যাই করে ফেলি! মিতুকে ডাকলাম, ও আমার মাথা থেকে আত্মহত্যার কথা একেবারে ঝেড়ে ফেললো। “জোর করে অ্যাবোরশন করতে গিয়ে নিজের জীবন দিয়ে দেওয়া কোনো সমাধান হতে পারে না। সুমনও এই পরিস্থিতির জন্য ইকুয়ালি দায়ী। তুই এতো স্যাক্রিফাইস কেন করবি? তোর লাইফটা কেন নষ্ট করবি?”

আমি অসহায়ের মতো মিতুর মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম। ও বললো, “এখন বিয়েই একমাত্র পথ।”

[৪]

সুমনকে বিয়ের কথা বলতেই ও বিগড়ে গেলো। কোনোদিন ও আমার সাথে রাগ করে কথা বলে নি, কিন্তু দুইদিন বিয়ের কথা বলতেই ওর নম্রতার মুখোশ কোথায় চলে গেলো! জানু, বেইবি, সুইটহার্ট ছাড়া আগে কথাই বলতে পারতো না, আর এখন দুনিয়ার যেকোন গালি দিয়ে কথা বলতেও বাঁধে না।

প্রথমে আমি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, এও কি সম্ভব! আমি হয়তো নিজেকেও অবিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু সুমন যে এভাবে বদলে যাবে কোনোদিন ভাবতেও পারিনি। মিতুই ঠিক বলেছিলো, ছেলেদেরকে কোনো বিশ্বাস নেই। কিন্তু আমি সুমনের ভালোবাসায় বিশ্বাস করেছি। ওকে বিশ্বাস করে নিজের সমস্ত ওর কাছে সঁপে দিয়েছি। কখনও মনে হয় নি আমি ভুল কিছু করছি। তাহলে কি সত্যিকার ভালোবাসা বলে কিছুই নেই? আমি কি ভালোবেসে, বিশ্বাস করে ভুল করলাম?

সুমন ইদানিং আমার ফোনও এভয়েড করছে। কয়েক দিন আগে ওর সাথে দেখা হয়েছিল। ও খুব ঠাণ্ডা মাথায় বলেছে, ঠিক আছে, বাচ্চা অ্যাবোর্ট করতে না পারো, জন্ম দাও, এরপর

মেরে ফেলো। লাগলে বইলো, আমি কোথাও ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো....

সুমনের কথা শুনতে ঘৃণায় গা রি-রি করছে। অপমানে চোখ জ্বলছে। তবুও কাঁদতে কাঁদতে মানানোর অনেক চেষ্টা করলাম। আমার দায়িত্ব নেয়ার কথা বলতেই ওর সমস্ত ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো।

“একই কথা নিয়ে বারবার প্যানপ্যান করবা না। আমার ডিসিশন জানায় দিছি, এখন আমার পক্ষে বিয়ে করা পসিবল না। ইফ ইউ ওয়ান্ট উই ক্যান বি লাইক বিফোর: বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড। দ্যাটস ইট!”

কতো সহজেই এসব কথা বলে দিতে পারে একটা ছেলে! অথচ একটা মেয়ে—কতো বড়ো দুর্যোগের মধ্য দিয়ে যায় সেটা কি কল্পনাও করতে পারে? আমি বুঝে ফেলেছি, এই পরীক্ষা আমার একার। সেদিন রাতটা মনে হচ্ছিলো দুঃস্বপ্নের মতো দীর্ঘ। কাঁদতে কাঁদতে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছি, শরীর-মন একদম অবসন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু এখন নিজের জন্য হলেও বাচ্চাকে জন্ম দিতে হবে। এরপর বাকি চিন্তা। মিতুর সহযোগিতায় বনানির একটা ফ্ল্যাটে সাবলেটে ভাড়া নিলাম। ওর

পরিচিত কয়েকজন সিনিয়র আপু আর জুনিয়র ছাত্রী একসাথে থাকে। বাবা-মা'কে বানিয়ে বললাম, ছাত্রী হোস্টেলে থাকতে হবে পরীক্ষার জন্য, অনেক পড়াশোনা - বাসায় বসে একা একা ম্যানেজ করতে পারছি না।

এর পরের কয়েকটা মাস গেলো বিভীষিকার মতো। জামাকাপড় ঢোলা করে বানিয়ে নিলাম, যেন পেট বোঝা না যায়। ছয় মাসের পর থেকে পেটটা আস্তে আস্তে বড়ো হচ্ছিল। আমি নিদেনপক্ষে বাইরে বেরোতাম না, পরিচিত কারো নজরে পড়তে চাই না। একান্তই বের হওয়া লাগলে গায়ের ওপর শীতে পড়ার একটা বড়ো খদ্দরের চাদর জড়িয়ে নিই। বাসার আপুদেরকে মিতু আগে থেকেই সব বলে রেখেছিল। মৌমিতা আপু, রোকসানা আপা আর রাহেলা। ওরা সবাই অনেক কেয়ারিং, অনেক ফ্রেন্ডলি! আমার পাশে ওরা যেভাবে ছিল, কোনোদিনও সেই ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না!

এদের মধ্যে মৌমিতা আপু আর রাহেলাই বেশি করেছে, বিশেষ করে রাহেলা। এই মেয়েটা এতো লক্ষ্মী আর হৃদয়বান! রোকসানা আপুও যখন যা পারতো করতো। কিন্তু চাকরি নিয়ে ব্যস্ততার কারণে বেশি সময় দিতে পারতো না। রাহেলা মেয়েটা বাসার বাকিদের চেয়ে আলাদা, বয়সেও আমাদের মধ্যে

সবচেয়ে জুনিয়র। প্রচণ্ড গরমেও দেখি কালো একটা বোরকা, নিকাব, হাতমোজা, পা মোজা ছাড়া বাইরে বেরোয় না। কে বলবে বাসার মধ্যে এই মেয়েটাই সবচেয়ে উচ্ছল! ওকে না চিনলে এরকম একটা বোরকাওয়ালি মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব করার কথা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতাম না! এতো তফাত আমাদের মধ্যে!

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার গরম লাগে না?

- খুব লাগে!

তাহলে এতোকিছু পরে জোকার সাজো কেন?

রাহেলা হাসতে হাসতে জবাব দিলো, আল্লাহকে ভালোবাসি আপা, তাই আল্লাহর জন্য কষ্ট করতেও ভালো লাগে।

ওর উত্তরটা শুনে একটু থতমত খেয়ে গেলাম। হায় ভালোবাসা! এই ভালোবাসার জন্য আমিও কতো কী করেছি! কিন্তু রাহেলার কথায় যুক্তি আছে, ভালোবাসলে সবই করা সম্ভব। মানুষ শরীর-মন সব বিকিয়ে দেয়, আর একটা কাপড় পরা আর এমন কী। আসলেই আগে ব্যাপারটা এভাবে ভেবে দেখি নি..

প্রায় রাতেই মাঝরাত পর্যন্ত আড্ডা বসতো, সেদিনও আড্ডা বসেছে। রোকসানা আপু বললেন, আমি বাবা-মায়ের কথা ছাড়া এক পাও এদিক-সেদিক করবো না। পড়াশোনা কম্প্লিট, চাকরি পেয়েছি ব্যাস। আমার ইচ্ছা সমাপ্ত। এখন আব্বা-আম্মা যেই পাত্রের সন্ধান আনবেন, সেখানেই কবুল।

মৌমিতা আপা সবচেয়ে মডার্ন। বলে উঠলেন, সুপাত্রই যে আনবেন তার নিশ্চয়তা কী? তুমি বড্ড বেশি আইডিয়াল চাইল্ড রোকসু...আমি তো হাসানকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ের কথা ভাবতেই পারি না! আর যাকে ভালোবাসি না, তার সাথে সংসার! ইম্পসিবল! হাসান হচ্ছেন মৌমিতা আপার ফার্স্ট লাভ - পাঁচ বছরের প্রেম, এখন পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় চলছে সবকিছু। কিন্তু আমার এখন আর এইসব ফার্স্ট লাভ, দীর্ঘদিনের প্রেম-ভালোবাসায় বিশ্বাস নেই। সুমনও আমার ফার্স্ট লাভ ছিল, আমাদের মধ্যে কোনো সমস্যাও ছিল না। তবুও ...

চিন্তার সুতো কেটে দিয়ে রাহেলা বলে উঠলো, আপুরা আমার চিন্তাভাবনার সাথে তোমার মিল হবে না জানি। কিন্তু আমি বিয়ের পরের ভালোবাসাতেই বিশ্বাসী।

যে ছেলেটা বিয়ের আগেই একটা মেয়ের সুন্দর চেহারা আর

শরীর দেখে ফেলেছে, সে আসলে ঠিক কোন কারণে মেয়েটাকে ভালোবাসলো কোনো চিন্তা করতে পারো, সৌন্দর্য্য নাকি মেয়েটার মানসিকতা? তাছাড়া আমার সাথে প্রেম করার অর্থ অন্য কোনো মেয়ের সাথেও সে রিলেশন করতে পারতো, আমি বিয়ের পর তাকে কীভাবে বিশ্বাস করবো?

তাহলে তুমি বিয়েটা করবা কীভাবে? এটা তো রোকসানার মতোই হলো, অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ। বাপ-মা ধরে বেঁধে একটা গাধা এনে দিলেও মালা পরিয়ে দিবে??

মৌমিতা আপুর খোঁচাটা গায়েই মাখলো না রেহালা। উল্টো প্রশ্ন করলো, যে ছেলেটা প্রেমিক হিসেবে অসাধারণ, সে যে স্বামী হিসেবেও দায়িত্ববান হবে - এটা কীভাবে বোঝা যায় আপু? **দুনিয়ার প্রত্যেকটা ছেলের সাথে এক এক করে প্রেম করে দেখা তো সম্ভব না যে কে বেশি ভালো, কাকে হাজবেন্ড হিসেবে চুজ করা উচিত**। পাত্রের ব্যাপারে আল্লাহর গাইডলাইনস ফলো করবো, আমার বাবা-মা অনেক ভালো হলেও উনারা আমার মতো করে সবকিছু দেখেন না, আমি বড়োলোক কোনো ছেলেকে বিয়ে করলেই সবাই খুশি। কিন্তু আমি চাই পরহেজগার কাউকে বিয়ে করতে। তাই এখন থেকেই মসজিদের ইমাম, পরিচিত বড়ো ভাই আর বোনদেরকে বলে

রেখেছি যেন এমন কোনো পাত্রের খোঁজ পেলে আমাকে জানায়। আপু, ইসলামে ডেটিং বলে কিছু নেই, কিন্তু বিয়ের আগে জানাশোনার কথা বলা আছে। ডেটিং-এ তো আদর-আহ্লাদ ছাড়া কোনো কাজের কথা হয় না। বিয়ের জন্য যেসব প্রশ্ন জানা জরুরি, সেগুলো জানতে দুজন মিলে একাকী বদ্ধ-কেবিনে হাত ধরাধরি না করলেও হয়। আমি আমার বাবার সামনে বসেও সেই প্রশ্নগুলো জেনে নিতে পারি, যেগুলোর উত্তর শুনে আমি আমার ফিউচার হাজবেন্ড বাছাই করবো।

রাহেলার কথাগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম আমি। প্রতিটা কথাই সঠিক। প্রতিটা কথাই যুক্তিসঙ্গত। অন্তরের গহীনে এসে কোথায় যেন কড়া নাড়ে।

[৫]

রাহেলা আমার ওপর বেশ প্রভাব ফেলছিল। একদিন বাইরে যাওয়ার সময় ওর থেকে চেয়ে একটা বোরকা নিলাম। মিতু, আমার বান্ধবী, মাঝে একদিন এসেছিল। আমার বোরকা ধরার কাহিনি শুনে চোখ কপালে তুলে বললো, কীরে হুজুর হয়ে গেলি নাকি? আমি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে লজ্জা পেয়ে বললাম, না, না, পেটটা বড়ো হয়ে যাচ্ছিলো। আসলে পেট বড়ো হয়ে

যাওয়াটাই একমাত্র কারণ ছিল না, কিন্তু কেন যে মুখ ফসকে মিথ্যে কথাটা বের হয়ে আসলো! বাসার বাকি সদস্যরা ধরেই নিলো পেট ঢাকার জন্যই বোরকা পরে বেরোচ্ছি। অবশ্য ওদের এই ভুল দ্রুতই ভাঙতে যাচ্ছিল...

দেখতে দেখতে ডেলিভারির দিন ঘনিয়ে আসলো। আমার মাথার মধ্যে দুঃস্বপ্নও চেপে বসতে লাগলো। কী করবো এই বাচ্চাকে নিয়ে? কোথাও ফেলে দিবো? নাকি মেরে ফেলবো? ভালোবাসার এই চিহ্ন এখন আমার জন্য অভিশাপের চিহ্নে পরিণত হয়েছে। একে কোথাও পুঁতে ফেলতে পারলে আমার শান্তি লাগতো। কিন্তু মাঝেই মাঝেই বেয়াড়া মা-বোধটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রাহেলার দেখাদেখি আমিও নামাজ ধরেছি। ফজর বাদে বাকি চার ওয়াক্ত-ই নিয়ম মতো পড়ছি। ফজরে রাহেলা ঠেলেঠুলে উঠিয়ে দেয়, ও না ডাকলে উঠতে পারিনা। গত আড়াই মাস বাসায় যাই নি, এই দুর্দিনে মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। যদিও আমি মায়ের সাথে তেমন ক্লোজ না, তবু তো মা! আজকাল মায়ের জন্য মনটা খুব আনচান করে।

এমন বিপদের মধ্যে হঠাৎ একদিন সুমনের ফোন এলো। বেশ সাধারণ ভাবে কথা বলছিল ও। আমিও এতোদিনে নিজেকে

সামলে নিয়েছি। আগের মতো কান্নাকাটি আর করলাম না, নিজেকে আর কতোই বা নিচু করবো। শীতল স্বরে শুধু বললাম, বলো কী বলবে। আমার গলার আওয়াজেই বোধ হয়, ও বেশি কিছু বলার সাহস করতে পারলো না। শুধু বললো, যদি কোনো দরকার হয় ডেকো। আমার পরিচিত এতিমখানার লোক আছে, সে ব্যবস্থা করতে পারবে। যদিও আমাদের জন্য এই বাচ্চার কোনো সাইন না রাখাটাই বেস্ট।

আমার মাথায় ধাই করে রক্ত চড়ে গেলো। কতো বড়ো দুঃসাহস যে আমাদের কথা বলতে এসেছে। দায়িত্ব নেবে না, আবার দেখাতে এসেছে সে আমাদের ব্যাপারে কতোই না চিন্তিত! কী পেয়েছে এই পশুটা? আমার বাচ্চার কোনো দায়িত্ব তো নেয়ই নি, এখন এসেছে আমার বাচ্চাকে খুন করতে! তোমার থেকে আমি কোনো অ্যাডভাইস চাই নি, বলে মুখের ওপর ফোনটা খট করে কেটে দিলাম।

এতোদিন মনের মধ্যে যা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল এখন সেটাও দূর হয়ে গেলো। এই বাচ্চা আমার বাচ্চা। ওকে আমি মেরে ফেলতে পারি না, না-না-না। আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। এই শিশুকে মেরে ফেলা হবে ঘোরতর পাপ। এক গুনাহর ভার এখনও বইছি, সন্তান-হত্যা করে আরেকটা জঘন্যতম অপরাধের

ভাগীদার আমি হতে চাই না।

কিন্তু কোথায় যাবো এই শিশু নিয়ে, কী করবো? বাবা-মায়ের সামনে কী জবাব দেবো?

মিতু, রাহেলা, রোকসানা আপু, কেউই সন্তোষজনক কোনো সমাধান দিতে পারলো না।

জীবনের এক একটা পর্যায় এতো জটিল, যার সমাধান কোনো মানুষের কাছেই থাকে না। রাহেলা শুধু বললো, আপা, দুয়া করেন। আপনি আল্লাহর দিকে পা বাড়াইসেন, আল্লাহ আপনাকে কখনও ফেলে দিবে না।

আমি শুধু দুয়াই করলাম। ফজরের নামাজ এখন নিয়মিত পড়ি। রাতের বেলা ঘুমও আসতে চায় না এখন আর, তীব্র ব্যাকপেইন আর মাথাব্যথা নিয়ে জেগেই থাকা হয়। ভোর রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি আর আল্লাহর দরবারে দুয়া চাই। বাচ্চাটাকে মারতে চাই না ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা করে দাও। ঘুরেফিরে এই একই দুয়া পাগলের মতো চাইতে থাকি.....

[৬]

আমার পরিবর্তন দেখে ধীরে ধীরে সবাই বুঝে যাচ্ছিলো যে আমি সাময়িক বোরকা ধরি নি, আসলেই বদলে গেছি। আরও পরিষ্কার হলো যখন দেখলো আমি কিছুতেই পুরুষ ডাক্তারের কাছে অপারেশন করাতে রাজি নই! মিতু তার চিরাচরিত স্বভাবমত একটা লম্বা ঝাড়ি দিয়ে বললো, মরতে চাস নাকি? বয়ফ্রেন্ডের সাথে রাত কাটাতে খারাপ লাগলো না, ডাক্তারের কাছে অপারেশন করাতে যতো লজ্জা।

মিতুটার মুখে কিছুই বাধে না। আমি দাঁতমুখ চেপে বললাম, দ্যাখ, সবকিছু মিলাস না। আগে এতো মেনে চলতাম না। পুরুষ ডাক্তারের কাছেও অপারেশন করবো যদি আর কোনো অপশন না থাকে। কিন্তু মহিলা ডাক্তারের খোঁজ করতে তো আর সমস্যা নেই। তুই পারলে আমাকে হেল্প কর – এতো ক্যানক্যান করিস না। মিতু ঠোঁটকাটা হলেও অবিবেচক না। আমাকে আর বেশি ঘাটালো না।

বললো, চল ঘুরতে যাই। উদ্দেশ্য শপিং! বাচ্চা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকে এখন মনটা বেশ ভারমুক্ত লাগে। শখও হয় অনেক রকমের। কিন্তু ভারি শরীর নিয়ে বেরোনো হয় না। মিতুই

আমাকে টেনে বের করলো ঘর থেকে। ছোট্ট সোনার জন্য ফিডার, জামা, জুতো, একটা ছোট্ট বালিশ, কয়েক প্যাকেট ডাইপার, আর রেডিমেড কাঁথা কিনে আনলাম। সেই দিনটা কী যে ভালো লাগছিলো! মা হওয়ার ব্যাপারটা যে এতো আনন্দদায়ক এতোদিন উপভোগই করতে পারি নি। শুধু দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনা আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিলো। কিন্তু এখন চিন্তা হলেই মনে মনে বলি, "হাসবি আল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল" আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, এরচেয়ে মন ভালো করা কথা আর আছে কোথাও?

ডিউ ডেইটের প্রায় তিন সপ্তাহ আগেই আমার ব্যথা শুরু হয়ে গেলো। অস্বাভাবিক ব্যথা! আমাকে দৌড়ে ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেলো রাহেলা আর রোকসানা আপু। মিতুও এলো কিছুক্ষণের মধ্যে। মাঝের পুরো তিন ঘণ্টা আমার কোনো হুঁশ ছিল না।

হুঁশ ফিরে শুনলাম, আমার ডেলিভারি হয়ে গেছে। জ্ঞান ছিল না, তাই সিজার করে বাচ্চা বের করা লেগেছে। আর সবচেয়ে আকস্মিক, সবচেয়ে ভয়ংকর, সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক খবরটা আমাকে ঠিক তখনই দেওয়া হলো। আমার বাচ্চাটা মারা গেছে। ব্রেইন হ্যামারেজের কারণে ডেলিভারির সময়ই ও মারা যায়।

আমি জমে গেলাম। অপ্রত্যাশিত হলেও বাচ্চাটাকে নিয়ে শেষপর্যন্ত অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম। সব প্রতিকূলতার মধ্যে ওকে জন্ম দিয়েছি, পুরো পৃথিবীর সাথে যুদ্ধ করে হলেও ওকে ভালোমত বড়ো করতে চেয়েছি। আমার মনের কুঠিরে জায়গা করে নিয়েছিল পাখিটা। চলে গেলো এভাবে? আমাকে একা ফেলে রেখে? খুব কষ্ট হলো, এই কষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তীক্ষ্ণ একটা বেদনা আমাকে চিরে ফেললো।

অথচ অদ্ভুত পৃথিবী, এই ভয়ঙ্কর দুঃসময়ে কয়েকটা অবিবাহিত মেয়ে ছাড়া আমার পাশে আর কেউই নেই। এরা কী বুঝবে আমার কষ্ট! ছাদের দিকে চোখ চলে গেলো। আল্লাহকে ডেকে বললাম, হে আল্লাহ তুমিই সবচেয়ে উত্তম অভিভাবক। আমার বাচ্চাটাকে তুমি দেখে রেখো।

[৭]

রাস্তার ধারের কোনো ডাস্টবিনে না, নর্দমার বর্জ্যতে না, টয়লেটে ফ্লাশ করেও না—আমার সন্তানকে আমি সবচেয়ে সুন্দরভাবে বিদায় জানালাম। হুজুর ডেকে ওর দাফন সম্পন্ন হলো, আমি বাদে বাকিরা সবাই নামাজ পড়লো। যে শিশুর মৃত্যু লেখা আছে, সে মারা যাবেই। বাবা-মা হয়ে নিজের হাতে

সন্তানকে খুন করা তো জানোয়ারও পারে না। আর মানুষ শরীরের ক্ষুধা, প্রেমের তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে শেষমেশ সেটাই করে...

এক সপ্তাহ হাসপাতালে থাকার পর আমি বাসায় ফিরে গেলাম। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হওয়ার কারণে রিকাভার করতে অনেক সময় লাগছিল। বাসা থেকে মিতু বুদ্ধি করে আগেই বাচ্চার জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলেছে। যেন আমার চোখে পড়লে আমি দুঃখ না পাই, অবশ্য এতোকিছুর দরকার ছিল না। আমি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখি আর আল্লাহকে মেনে চলি। এখন আমার সাথে যেটাই হোক, আমি আর ভয় পাই না। ভেঙেও পড়ি না। রোকসানা আপু বদলি হয়ে গেছেন শুনলাম, আমারও এই বাসা থেকে বেরোনোর সময় হয়ে গেছে। নিজের বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যেতে হবে এবার...

মনে হলো যেন একটা যুদ্ধ শেষ হলো। কিন্তু ফিরতে হলো খালি হাতে। আসলে খালি হাতে না, হাতে ইসলামের আলো নিয়ে ফিরছি - এটাই তো সবচেয়ে বড়ো পাওয়া!

বাসায় বাবা-মা আমাকে প্রায় তিন মাস পর দেখছেন। আমার পরিবর্তনে খুব হতবাক সবাই। যেন আমাকে চিনতে পারছে না

কেউ।

এর প্রায় দুই মাস পরে হঠাৎ একদিন সুমন ফোন দিয়েছিল। গলা শুনে মনে হলো যেন খুব কান্নাকাটি করেছে। ভেক ভেক করে হেঁচকি তুলে আমাকে বললো, সে 'মেইক আপ' করতে চায়! যতো সব ভণ্ডামি। পুরো প্রেগন্যান্সির সময় আমাকে মাঝ সমুদ্রে ফেলে দিয়ে এখন এসেছে আবার আমার শরীর এনজয় করতে! মানুষই পারে এতোটা নির্লজ্জ হতে।

আজ ভাবছিলাম, আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন। পৃথিবীর প্রতিটা ঘটনার পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। এক একটা পরিস্থিতি তৈরি করে তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর কাছে আসার সুযোগ করে দেন। **কেউ সেই সুযোগটা কাজে লাগায়, আর কেউ ছুঁড়ে ফেলে**। প্রথমে বাচ্চা রাখার কোনো ইচ্ছাই ছিল না, অথচ বাচ্চা জন্ম দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না। এরপর আল্লাহর ভয়ে বাচ্চাটা রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন আল্লাহ অন্য ইচ্ছা করলেন। আর একদিক থেকে ভাবলে এভাবেই আল্লাহ আমাকে বেইজ্জত হওয়া থেকে রক্ষা করলেন। মাঝখান দিয়ে সুমন আর সুমনের মতো সব ছেলের চেহারা স্পষ্ট করে দিলেন। বিয়ের আগে প্রেমগুলো কতো সস্তা, কতো ঠুনকো, কতো মেকি! অথচ ছেলেমেয়েরা অন্ধের মতো

এর পিছেই ছুটতে থাকে...

মিতু এখনও আগের মতোই আছে। কিছু মানুষ কখনোই শিক্ষা নেয় না। আমার এতো বড়ো ঘটনার পরেও ও ঠিক আগের মতো রয়ে গেলো। ছেলে ঘুরিয়ে মজা নিচ্ছে। খোলামেলা ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন যার সাথে ইচ্ছা শুয়ে পড়ছে। ওর সাথে আগের মতো আর মিশতে পারিনা, বন্ধুত্ব আছে কিন্তু অশ্লীল রসিকতা নেই। ছেলেদের সাথে বসে আড্ডা দেই না দেখে দেখাসাক্ষাতও কম হয়। রোকসানা আপুর খবর অনেকদিন জানিনা। তবে মৌমিতা আপুর কথা মিতুর মুখেই শুনেছি, পাঁচ বছরের সেই ফার্স্ট লাভকে ছেড়ে তিনি কানাডার আরও উচ্চশিক্ষিত এক পাত্রকে বিয়ে করে এখন কানাডায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হায়রে ফার্স্ট লাভ! হায়রে মরার প্রেম!

রাহেলার সাথে বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়েছে। যদিও ও আমার ছোটবোনের মতো। সামনের মাসে ওর বিয়ে। ছেলে ছাত্র, একই সাথে ব্যবসাও করছে। কম বয়সেই বিয়ে করতে চায়, রাহেলার দ্বীনদারিতা দেখে ওকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। রাহেলা বলে, একবার বিয়েটা করি, এরপর বরের সাথে মিলে তোর ঘটকালি করবো... হি হি।

আমি অনেক বদলে গেছি। অ-নে-ক। এখন রাহেলার মতোই হাত মোজা-পা মোজা পরি।

দূর থেকে দেখে একদিন মিতু বলেছিল, “তোকে দেখে ভেবেছি রাহেলা কী করে এইখানে! সো কনফিউজিং!”

আমি মনে মনে হাসি। আল্লাহ আমাকে অনেক দিলেন।

এক জীবনে আল্লাহকে খুঁজে পেলে আর কী চাওয়ার থাকতে পারে.....

মুলপাতা

আঁধার-আলো

21 MIN READ

BY

Anika Tuba

May 16, 2016

bibijaan.com/id/250